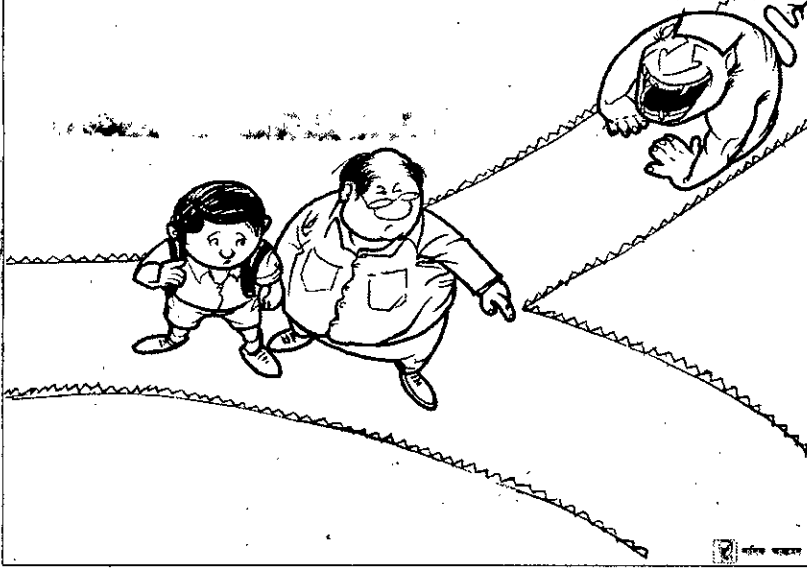




“জঙ্গী শনাক্তে শিক্ষা” প্রতিষ্ঠানের করণীয়

জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ডে সাম্প্রতিক কিছু নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে বিত্তশালী পরিবারের সন্তানরা তাতে জড়িয়ে, যার ফলে জঙ্গী বাহিনীতে হতদরিদ্র, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের এক ধরনের সংমিশ্রণ ঘটছে। এক সময় উচ্চবিত্তের সন্তানরা ছিল নিম্ন আর্থিক শ্রেণীর সন্তানদের রেফারেন্স গ্রুপ। জঙ্গীদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর আজ রেফারেন্স গ্রুপ ও রিয়েল গ্রুপ একাকার হয়েছে বলে নারকীয় তান্ডব এবং বন্যতার প্রথরতা বেড়েছে। আমি মনে করি এই কৌশলগুলোর গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। জঙ্গীরা আর একটি মাত্রা যুক্ত করছে, তা হলো হিন্দু বা সংখ্যালঘু হতদরিদ্রকে ধর্মগুরুত্ব করে জঙ্গীতে পরিণত করা। এই সেই সাইফুল্লাহ যে হিন্দু ছিল। পলক দাশ থেকে মুসলমানে রূপান্তরিত। এটি চিন্তার বিষয়। চিন্তার বিষয় মুসলমান ছেলেদের হিন্দু বা খ্রীস্টান নাম গ্রহণ। এমনিতে তাদের

অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

একাধিক নাম গ্রহণ সবার জন্য বিভ্রান্তিকর। মোট কথা, জঙ্গীবাদীদের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং জঙ্গীদের তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার সমস্যাটিকে কঠিন করেছে। কিন্তু এটা নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে সবাইকে কমবেশি দায়িত্ব নিতে হবে।

শিক্ষাঙ্গনে আমরা দেশের তরুণ সমাজের একাংশকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পেয়ে থাকি। তারা নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা আমাদের হাতে থাকে বলে সব দায়িত্ব অন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত হতে পারব না। আমাদের হাতে ৪/৫ ঘণ্টা যে সময়টুকু শিক্ষার্থীরা থাকে সে সময়টাতে আমাদের চোখ-কান খোলা রাখতেই হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু ব্যবস্থা নিয়ে সফল পেয়েছি, যা অন্যরাও অনুশীলন করে দেখাতে পারেন।

১. ভর্তির সময়েই পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাতকারের মাধ্যমে সন্তাসী সন্তাসীদের বের করা সম্ভব। দেশে কিছু কলেজে সন্তাসী পালিত হয়। সেসব কলেজের শিক্ষার্থী নির্বাচনে একটু বাড়তি সতর্কতা নিতে হবে এবং আমরা নিয়েও থাকি।

২. শিক্ষার্থী ভর্তির পর তাদের নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ভর্তির পরই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সার্বিক দেখাশোনার দায়িত্ব একজন করে শিক্ষকের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি, যা অন্যরা করতে পারেন। এসব শিক্ষককে আমরা কাউন্সিলর বা মেন্টর বলি। একজন মেন্টর ১৫-২৫ জন শিক্ষার্থীর সামগ্রিক দায়িত্ব নেন। এই সামগ্রিক অর্থ হচ্ছে A to Z বা জুতা সেলাই থেকে চণ্ডিপাঠ পর্যন্ত। শিক্ষার্থীরা অনুপস্থিত থাকলেও এর কারণগুলো আমরা তিন দিনের মাথায় জেনে,

যাই। অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর প্রথমেই কাউন্সিলর, তারপর কোর্স শিক্ষক ও তারপর রেজিস্ট্রার অফিস খবরদি নেয়। শিক্ষার্থী ও তার বন্ধুবান্ধব থেকে তথ্য না পেলে খবরাদির জন্য অভিভাবক বা পিতা-মাতার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এ ব্যবস্থা অনুসরণ করা যেতে পারে।

৩. আমাদের শিক্ষার্থীরা যে সব মেস বা হোস্টেলে অবস্থান করে তাদের দেখভালের জন্য শিক্ষা ও প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে মেস বা হোস্টেলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

৪. ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী কি করে, বিশেষত বিরতির সময় কি করে তা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব তলায় ও কক্ষ সিসি টিভি বসানো যেতে পারে। তদুপরি প্রতি তলায় নির্দিষ্ট সংখ্যক পর্যবেক্ষক রাখা এবং প্রত্যেক দালানের জন্য এক বা একাধিক সুপারভাইজার নিশ্চিত করা আবশ্যিক।

বিগত ৮ বছরে বহু বর্ণচোরার রূপ ও ভোল পালাতে আমরা দেখেছি। জঙ্গী ও সন্তাসী কাজের উদ্ভাবন আমাদের ছত্রছায়ায় কেউ উৎসাহিত করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এখনও দেখা যাচ্ছে যে, বর্ণচোরারা পকেটে বসেই পকেট কাটছে। সরকারের সঙ্গে যাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে তারা অতি ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে বর্ণচোরারা কৌশলগত অবস্থানে বসে যাচ্ছে

৫. শিক্ষার্থীরা কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে কিংবা কম্পিউটারে কি কি পোস্ট দেয় তার প্রতি নজর দেয়ার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এটা শিক্ষার্থীদের অজ্ঞাতে করা যায়। কম্পিউটার রুমের দায়িত্বপ্রাপ্তরা এবং ক্যান্টিন, লাইব্রেরী ও উপাসনা কক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্তরা কাজটি করে থাকেন।

৬. শিক্ষক নিয়োগের সময় বিশেষ প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা এমন প্রার্থীদের ব্যাপারে অতিরিক্ত নজর দেয়া উচিত। সাক্ষাতকারে কিছু উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন করার মাধ্যমে তাদের মৌলিক প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। তারপর তাদের সম্পর্কে অনানুষ্ঠানিক খবরাদি নেয়া যেতে পারে। এরপর নিয়োগের আগে তাদের ডেমোনেস্ট্রেশন ক্লাসে নেয়া যেতে পারে। এখানেও সন্তাসী বা জঙ্গী প্রবণতা বের করার প্রয়াস চালানোর সুযোগ পাওয়া যাবে।

৭. আমরা সামগ্রিক অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, খন্ডকালীন শিক্ষকরা কোন দায়িত্ব নেয় না; কিন্তু

কর্তৃত্ব ফলাতে পারেন। এদের অন্যতম প্রধান কাজ নিজের বিশ্বাস ও বোধকে কোমলমতি ছাত্রদের মাঝে প্রোথিত করা। এরা যে সরকারী দলের সঙ্গে মিশে গিয়ে কাজ করে না তা হালফ করে বলতে পারব না। বিগত ৮ বছরে বহু বর্ণচোরার রূপ ও ভোল পালাতে আমরা দেখেছি। জঙ্গী ও সন্তাসী কাজের উদ্ভাবন আমাদের ছত্রছায়ায় কেউ উৎসাহিত করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এখনও দেখা যাচ্ছে যে, বর্ণচোরারা পকেটে বসেই পকেট কাটছে। সরকারের সঙ্গে যাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে তারা অতি ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে বর্ণচোরারা কৌশলগত অবস্থানে বসে যাচ্ছে। আমরা যাতে এসব বিষয় কোনরূপ শঙ্কা ছাড়া সর্বস্তরে তুলে ধরতে পারি তার জন্য পথ উন্মুক্ত রাখতে হবে। খন্ডকালীন নিয়োগ দিতে পূর্ব পরিচিতদের গুরুত্ব দেয়া বাঞ্ছনীয়। কোন শিক্ষকের মাঝে ভিন্নতর প্রবণতা পরিলক্ষিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তা নোট করা দরকার এবং প্রশাসন থেকে এমন ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। এসবের কারণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গী উত্থানের মতো কোন কিছু আজও দেখিনি। তবে এজন্য বিভিন্ন ধরনের হুমকি-ধমকির সম্মুখীন হতে হয়। এসব হুমকি-ধমকির স্বরূপ বিচিত্র। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের আমরা কখনও কখনও এসব অবগত করে থাকি। আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের সভাপতি। এ অবস্থানে থেকে দেশের প্রাইমারী স্কুল বা এবতেদায়ী মাদ্রাসা হতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে আমাদের সংগঠন। এ অবস্থানের কারণে আমরা পর্যাপ্ত সুরক্ষা, পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে জঙ্গী চিহ্নিতকরণে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে সক্ষম। সারাদেশেই আমাদের নেতা-কর্মীরা শাখা বিস্তারে সক্ষম।

ক. শিক্ষক নিয়োগে, বিশেষত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ ডেরিফিকেশনের মাধ্যমে নিয়োগ দেয়াটা কঠিন নয়। তবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে টার্নওভার রেট অতি উচ্চমাত্রার এবং শিক্ষকদের পুনর্নিয়োগ স্বল্প সময়ের মধ্যেই করতে হয় বলে পুলিশ ডেরিফিকেশনটা আমরা নিয়োগের পরেই করতে চাই। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যানের পর্যবেক্ষণটি আমরা গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করছি। তদুপরি নিয়োগকালে একটি অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করিয়ে নেয়া যেতে পারে। এটা হতে পারে এমন—“আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমি কোন সন্তাসী বা জঙ্গী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলাম না বা জড়িত নই। আমি আরও আশ্বস্ত করছি যে, আমি কোন জঙ্গী, সন্তাসী ও মাদক সমস্যা অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে অবগত করব।”

খ. শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতি রেকর্ডের জন্য বায়োমেট্রিক পদ্ধতি অনুসরণ ছাড়াও বিভাগগুন্নরী খাতায় নিপিবদ্ধ করা কাজে আসতে পারে।

গ. শিক্ষার্থীদের জন্য নীতি ও নৈতিকতার বিষয়ে বক্তৃতা আয়োজন করা প্রয়োজন। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যাতে বাড়ানো যায় সেজন্য অভিভাবক ছাড়াও অন্যদের প্রভাব বিস্তারের পথ সুগম করা দরকার। তদুপরি মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পর্কে তাদের দীক্ষিত করা অতি জরুরী। সাম্প্রতিক সময়ে ইউজিসি পূর্বের একটি কোর্সের সঙ্গে দুটি নতুন কোর্স সবার জন্য বাধ্যতামূলক করেছে। নিঃসন্দেহে এটা একটা প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। জঙ্গী ও সন্তাসীরা বাংলাদেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যার ফলে তাদের মাঝে জঙ্গীবাদ বা সন্তাস প্রোথিত করা সহজ।

লেখক : মুক্তিযোদ্ধা ও উপাচার্য,
ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ